দৈনিক খবর

তারিখ 20 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

23

প্রসঙ্গ ঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষা বিস্তার তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ—এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই। ২ হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা— এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল করে তুলতেই হবে। সেজন্যে সরকারের এই কর্মসূচীকে আমরা সঠিক এবং যথার্থ বলে বিবেচনা করি। এই কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য সরকার 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' এই নামে পৃথক যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। এই কর্মসূচীর আওতায় স্কুল গমনোপযোগী যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে অত্যন্ত দরিদ্র তাদেরকে খাদ্য দিয়ে সাহায্য করা হবে যদি তারা স্কুলে পড়াশুনা করে। অত্যধিক দারিদ্র্যের কারণে স্কুল গমনোপযোগী যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে আগে স্কুলে ভর্তি হতো না বা ভর্তি হলেও একপর্যায়ে লেখাপড়া বাদ দিতো তাদের জন্যে এ কর্মসূচী খুব সহায়ক হবে। কেননা, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের সুবিধা থাকার পরেও স্কুল গমনোপযোগী বহু শিশু স্কুলে পড়তে আসতো না— তার প্রধান কারণ হচ্ছে খাদ্যাভাব বা দারিদ্র্য। 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে দরিদ্র শিশুদের আর সে সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে না। আরো আশার কথা এই যে, সরকার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল ছাত্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থাও নিতে যাচ্ছেন। সন্দেহ নেই, সরকার কর্তৃক গৃহীত এসব ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান অনেক বাধাই দূর করতে সহায়তাকরবে।

কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সরকারকে আরো কতিপয় সমস্যার ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে বিষয়টির কথা উল্লেখ করতে হয় তাহলো তাবৎ বছরে শিক্ষার সময় বা ঘন্টা। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বছরে মাত্র ৪৪৪ ঘন্টা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অথচ চীনের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বছরে ১২৩৫ ঘন্টা ক্লাস হয়। ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনে হয় যথাক্রমে ১১০০ এবং ৭৫০ ঘন্টা। সম্প্রতি বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় এই তথ্য প্রকাশ করে বলা হয়, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রতি ক্লাসের সময়সীমা মাত্র ৩৫ মিনিট। এরমধ্যে পাঁচ মিনিট সময় যায় শিক্ষকদের এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যেতে, পাঁচ মিনিট সময় নষ্ট হয় ছাত্রদের রোলকলে, পনের মিনিট যায় হোম টাস্ক দেখতে এবং অবশিষ্ট মাত্র দশ মিনিট ছাত্রদের শিক্ষা দেয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্যে আরো প্রকাশ, বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার সময়সীমা কম থাকা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা না হওয়ায় শিশু ঝরে পড়ার হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের দূরত্ব, ছাত্রীদের নিরাপত্তা, মহিলা শিক্ষকের আন্তরিকতা, বাল্যবিবাহ, মেয়েদের পৃথক শৌচাগার প্রভৃতি কারণে দেশে প্রতিবছর শতকরা ২৪ জন শিশু ঝরে পড়ছে। অর্থাৎ এরা লেখাপড়া বাদ দিচ্ছে। অথচ তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু ঝরে পড়ার হার পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালে শতকরা ১৮ জন, ভারতে ১২ জন, পাকিস্তানে ১২ জন, থাইল্যান্ডে ৯ জন, ফিলিপাইনে ৭ জন এবং ইন্দোনেশিয়ায় মাত্র শতকরা ৬ জন। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের জরিপ অনুযায়ী ১৫ বছরের উর্ধ্বে মহিলাদের শিক্ষিতের হার বাংলাদেশে শতকরা ২২ ভাগ। পক্ষান্তরে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ডে যথাক্রমে ২৯, ৬৫, ৮৩ এবং ৮৮ ভাগ।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে এমন কিছু সমস্যা এখনও রয়ে গেছে যেগুলো দূর করতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা সম্ভব হবে না। বিশেষ করে ছাত্রীদের সমস্যার ব্যাপারে সরকার আন্তরিক না হলে পরিস্থিতির তেমন কোন পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। দূরের স্কুলে ছাত্রীদের পক্ষে যাওয়া-আসা বাস্তবিকই খুব অসুবিধাজনক। তাছাড়া তাদের নিরাপত্তার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ছাত্রীরা ছাত্রদের মত নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে না এটা এক বাস্তব সত্য। আবার অনেক স্কুলে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। যে কারণে তাদের খুবই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। এসব নানা অসুবিধার মুখে অনেক ছাত্রীই বিদ্যালয়ে আসতে নিরুৎসাহবোধ করে। আবার বাল্যবিবাহের কারণেও অনেক ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এইসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায় হচ্ছে কম দূরত্বে বিদ্যালয় এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা, ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা সর্বোপরি বাল্যবিবাহ বন্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ক্লাসের সময়সীমা বাড়ানোর ব্যাপারটিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল করে তুলতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুধু সুযোগ-সুবিধা বাড়ালেই চলবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কতটুকু পাচ্ছে সেটাও বিচার্য বিষয়। শুধু বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসাই এই কর্মসূচীর সার্থকতা প্রমাণ করে না। বিদ্যালয়ে গিয়ে তারা কিছু শিখতে পারছে কিনা অর্থাৎ তারা প্রকৃত শিক্ষা পাচ্ছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখতে হবে। আর সেটা নিশ্চিত করার জন্যে চাই ক্লাসের অধিক সময়সীপমা। বাৎসরিক ছুটি হ্রাস করে এবং ক্লাসের সময় বাড়িয়ে তা করা যেতে পারে। একই কারণে আমরা শিক্ষক এবং শিক্ষা উপকরণের অভাব দূরীকরণের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিচ্ছি।